লিলিয়ান- এক মৎস্য কন্যার গল্প

অর্ণব চক্রবর্তী

দিপুদি, আর্কটিক তিমি নাকি ১৫, ১৬ হাজার কিমি মাইগ্রেট করে, তাও নাকি সন্তানের জন্ম দেয়ার জন্য! কি নাম যেন সেই প্রজাতির, হাম্পব্যাক না কি যেন?

দিপুদি আটপৌরে মহিলা। কর্পোরেশনের ওয়ার্ড অফিসে কাজ করে। ঠিক কি কাজ আমি জানি না। তবে প্রতিদিন সাদা পাটভাঙা শাড়ি পরে অফিস যায়। কোনোদিন নীল পাড়, কোনোদিন খয়েরি। কোনো কামাই নেই অফিসে। অনেকদিন আগে একবার উত্তরাখণ্ডের মতিচুর গিয়েছিল। সেই সময় কিছুদিন ছুটি নিয়েছিল। ব্যাস ওইটুকুই । একবার ভেবেছিলাম জিজ্ঞেস করি সব ছেড়ে মতিচুর যাওয়ার কারণ। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো হয়ে যাবে ভেবে আর জিগ্যেস করিনি। এহেন অতি সাধারণ দিপুদি অফিস থেকে তিন মাসের ছুটি নিয়ে আলাস্কা চলে গেল। এলাকার প্রায় সকলেরই তো চক্ষু ছানাবড়া। এই আমি, যে কিনা অফিসের কাজে বারকয়েক বিলেত গিয়েছি, সেই আমিও যারপরনাই অবাক হয়েছিলাম। জনান্তিকে শোনা গিয়েছিল, দিপুদি নাকি তিমি মাছ নিয়ে রিসার্চের কাজে আলাস্কা যাচ্ছে। সকলের মতো আমিও ভয়ানক বিষম খেয়েছিলাম। যে মহিলার সাত কুলে কেউ আছে বলে জানা নেই, রাস্তার কুকুর আর বারিক চ্যাটার্জি রোডের ফুটপাথের ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে ছুটির দিন কাটায়, সে কিনা সব কিছু ছেড়ে তিমি নিয়ে রিসার্চ করতে যাচ্ছে, তাও আবার আলাস্কা। অন্য অনেকের মতোই, আমারও ঠিক হজম হয়নি ব্যাপারটা।

যেদিন দিপুদি একটা বিশাল সুটকেস আর একটা ঝোলা ব্যাগ নিয়ে, হলুদ ট্যাক্সি ধরে এয়ারপোর্ট রওনা দিয়েছিল, সেদিন এক বিশেষ কাজে আমি এলাকার বাইরে ছিলাম। দিপুদির সাথে আমার দেখা হয়নি। তাই, তিমি মাছের উপর রিসার্চ করতে যাওয়ার সময় মানুষের চেহারা কেমন হয়, আমার আর জানা হয়ে ওঠেনি। তবে ঠিক তিন মাস পরে দিপুদি যেদিন ফিরল, সেদিন দেখা হয়েছিল, গলির মোড়ে। সুটকেস আর কাঁধের ঝোলা ব্যাগ ছাড়াও সেদিন পিঠে একটা অতিরিক্ত নর্থ ফেসের ন্যাপস্যাক। আর সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলাম, দিপুদির পোশাক দেখে। আটপৌরে মফস্বলের মহিলার গায়ে টিশার্ট আর জিন্স। টিশার্টের উপর লেখা, আর্কটিক প্লাঞ্জ, আঙ্করেজ, আলাস্কা। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল খুব ক্লান্ত। তাই কেমন হল ট্রিপ, এর বেশি আর কিছু জিগ্যেস করিনি। দিপুদিও হালকা হেসে ঘাড় নাড়িয়ে যা বুঝিয়েছিল, তার অর্থ, ভালো। ব্যাস তারপর আবার দিপুদি সাদা শাড়ি পরে ওয়ার্ড অফিসের কাজে লেগে পড়ল। কিছুতেই সুযোগ আসছিল না, আমার অসীম কৌতূহল মেটানোর। তারপর একদিন সুযোগ এসে গেল।

দিপুদি যে বাড়িতে থাকে সেটা প্রায় ভগ্নপ্রায় একটি একতলা বাড়ি। সামনের কিছুটা জায়গা ঝোপঝাড়ে ভরে গিয়ে বাড়িটার অধিকাংশই ঢেকে দিয়েছে। একটা বাউন্ডারি পাঁচিল আছে বটে, তবে তার দশাও প্রায় একই রকম। সামনে একটা অর্ধেক মানুষ সমান লোহার গ্রিলের দরজা। যার কব্জাগুলো মরচে পরে নষ্ট। বাড়িটি দিপুদিদের পৈতৃক কিনা জানা নেই। আসলে দিপুদির পরিবার, তার মা, বাবা, এসব সম্পর্কে কোনো খবরই আমার জানা নেই। সে অর্থে দিপুদি বেশ রহস্যময় এক মানুষ। কিন্তু পাড়ার সকলের সঙ্গেই তার ভালো সম্পর্ক। আসা যাওয়ার মাঝে হেসে দুচারটে কথা, কি কেমন আছেন, বাড়ির সকলে ভালো আছে তো, আমি ভালোই আছি, হ্যাঁ একটু কাজের চাপ চলছে, ইত্যাদি বাক্যাংশ সেরে, মিষ্টি একটা হাসি মুখে রেখে দিপুদি চলে যায়। পাড়ার অতি চালাক বা দিগগজ লোকেরাও বেশি কিছু জেনে উঠতে পারেনি। দিপুদির বাড়ি কেউ কোনোদিন গেছে বলে জানা

নেই। আর দিপুদিও কারো বাড়ি যায়নি। এহেন দিপুদি এক রবিবার সকালে হঠাৎ করে আমার বাড়ি এসে উপস্থিত। আমি দোতলা থেকে নামতে নামতে দেখি দরজায় দাঁড়িয়েই মার সাথে কথা বলছে। তুমি নাকি সেই আমেরিকা গেছিলে, সবাই বলছিল কি সব পড়াশুনার কাজে, ওখানে তো শুনেছি খুব ঠান্ডা, তিন চারতলা বাড়ির সমান উঁচু উঁচু বরফের টুকরো জলে ভেসে বেড়ায়, বাব্বা, আমি তো ভাবলেই কি রকম ঠান্ডায় গুটিশুটি মেরে যাই, তুমি নিশ্চয়ই অনেক গরম জামাকাপড় নিয়ে গিয়েছিলে, শরীর খারাপ টারাপ হয়নি তো। মা নিজের মতো বলেই চলেছে, আর দিপুদি ঠিক যতটুকু না বললেই নয়, হাসি মুখে উত্তর দিচ্ছে। আমি পাশে গিয়ে বলি, হ্যাঁ দিপুদি বল। আচ্ছা তোমার বাড়িতে ইন্টারনেট আছে না। হ্যাঁ, আছে তো। অনেক সময়েই অফিসের কিছু কাজ বাড়ি থেকে করতে হয়। তা তোমার আপত্তি না থাকলে, আমি কি একটু ব্যবহার করতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো অসুবিধাই নেই, এখন করতে চাও। হলে খুব ভালো হয়।

আমি দিপুদিকে নিয়ে দোতলায় আমার ঘরে আসি। কম্পিউটারটা অন করে ইন্টারনেট চালাই। গুগুলটা কি খুলে দেবো। দিপুদিকে জিগ্যেস করি। না দরকার নেই, আমি ইয়ান্দেক্স ব্যবহার করি। আমি অবাক হয়ে যাই, এক সাদামাটা কর্পোরেশনের ওয়ার্ড অফিসে চাকরিরতা মহিলা এমন এক সার্চ ইঞ্জিনের কথা বলছেন, যেটা খুব সামান্য কিছু মানুষ ব্যবহার করে। আর সেই মানুষেরা থাকে রাশিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। আমি যে অনেক কিছু জানি, তা নয়। কাজের সূত্রে একবার এই সার্চ ইঞ্জিনের নাম শুনেছিলাম। ব্যাস ওইটুকুই। দিপুদি চেয়ারে বসে ইন্টারনেট খুলতে, আমি ঘর ছেড়ে বাইরে বেড়িয়ে আসি। কোনো গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিগত কাজ করবে নিশ্চয়ই দিপুদি, আমার সামনে থাকা উচিত নয়। বারান্দায় এসে রোববারের কাগজটা খুলে বসি। হয়ত আধঘণ্টা সময় কেটেছে। মা ইতিমধ্যে আমাকে ডেকে দুকাপ চা পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার চা শেষ হওয়ার আগেই দিপুদি সামনে এসে দাঁড়ায়। আমার হয়ে গেছে বুঝলে। আমি একটা ফাইল পাঠানোর জন্য তোমার মেশিনের আইপি একবার বাউন্স করেছিলাম। এখন আবার রিভার্ট করে দিয়েছি। তোমার কাজে কোনো অসুবিধা হবে না। আসি আজ। অনেক ধন্যবাদ গো। খুব উপকার হল। আমি কাগজ থেকে মুখ তুলে থতমত হয়ে বসে থাকি। দিপুদি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। ভাবতে থাকি এই মহিলা আইপি বাউন্স করতেও জানে। আমার আর কত অবাক হওয়ার বাকি কে জানে।

আমার উচিত নয়, একদমই উচিত নয়। কিন্তু কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। ইন্টারনেট অন করে হিস্ট্রি দেখার চেষ্টা করলাম। একদম সাফসুতরো। কোনো ট্র্যাক নেই, কোথায় কোথায় গিয়েছিল, কোনো পথে গিয়েছিল। আর কেন গিয়েছিল, তার উত্তর পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। শুধু ডেস্কটপে একটা ছোটো নোটপ্যাড ডিলিট করতে ভুলে গেছে বোধহয়। নাকি ডিলিট করতে চায়নি। আমি যাতে খুঁজে পাই সেজন্য রেখে গেছে। কিন্তু নোটপ্যাডের লেখা আমার বোধগম্যের বাইরে রয়ে গেল। যা লেখা ছিল তা মোটামুটি এইরকম –

উলরিচ সেউদেল, অন্দ্রেয়াস হরভাথ, মাইকেল পাম, অন্দ্রেয়াস হরভাথ, ইউকন, 65. 8938° N - 168. 3954° W 66° N - 172° W জেনাস মেগাপটেরা, ম্যাথুইস জ্যাকুইস ব্রিসন, রেগনাম অ্যানিমিলে, 1756. আর কিছুটা ফাঁকা রেখে - প্যাট্রিকজা প্ল্যানিক।

এসব আমার কাছে হিব্রু বললেও কম বলা হয়। কিন্তু প্রকারান্তরে যেটা হল, দিপুদির প্রতি একটা রহস্যের টান তৈরি হয়ে গেল। একজন মাঝবয়সি মহিলার প্রতি যেরকম টান তৈরি হয়, এটা ঠিক সেরকম টান নয়। একটা পথনির্দেশ পাওয়ার টান। একটা ইতিহাস জানার টান। এমনিতে দিপুদির চেহারা বেশ অন্যরকম। ঠিক বাঙালি মহিলাদের মতো নয়। দোহারা, তামাটে বর্ণ, একটু চ্যাপ্টা নাক, বাদামি- ঘেঁষা চুল কোমর পর্যন্ত, আর উচ্চতা

চোখে পড়ার মতো। কাঁধ আর হাতের কব্জি দেখলে, কেমন যেন মনে হয়, ছোটোবেলায় নিশ্চয়ই খেলাধূলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। চওড়া আর বলিষ্ঠ কাঁধ আর কব্জি তো নির্দিষ্ট কিছু খেলা এবং অনুশীলনেই তৈরি হয়, আমার সেরকমই ধারণা। তবে চোখদুটো একটু চাপা ও ছোটো, আর গাল দুটো একটু বসা। কিন্তু আমার টানের সাথে শারীরিক গঠনের দূরদূরান্তে কোনো যোগাযোগই ছিল না।

এরপরও কয়েকদিন দিপুদি এসেছিল আমাদের বাড়ি। ওই ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য। মোটামুটি তারপর আধ ঘণ্টার মধ্যে কাজ সেরে, অনেকবার করে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যেত। তবে দু'একটা করে কথাবার্তা শুরু হয়েছিল। বুঝতে পারছিলাম, দিপুদি চাইছে তাই কথাবার্তা হতে পারছে। সেদিক দিয়ে দেখলে ভদ্রমহিলার অসম্ভব মাত্রাজ্ঞান, আর ব্যক্তিত্ব। ঠিক যেটুকু বলতে চান, কথাবার্তা সে পর্যন্ত এগোয়। তারপর শেষবারের মতো ধন্যবাদ জানিয়ে ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। এই রকম এক বিকেলে, সেদিন আবার কালীপুজো, দিপুদি এলো। যথারীতি ইন্টারনেটে কিছু কাজকর্মের জন্য। সেদিন যেন একটু বেশি সময় লাগছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দীপান্বিতা অমাবস্যা নেমে আসবে ধীরে। আমি বারান্দায় লাগানো টুনি বালবগুলো জ্বালিয়ে দিলাম। আশেপাশের সব বাড়িতেই রঙবেরঙের নানা আলো জ্বলে উঠছে। সামনের রাস্তায় পাড়ার বাচ্চাগুলো বাজি ফোটানো শুরু করেছে। বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে আমি আকাশে ফুটতে থাকা জমকালো সব বাজির কেরামতি দেখছি, হঠাৎ দেখি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দিপুদি। আজ একটু বেশি সময় লেগে গেল। তোমার অসুবিধা হল না তো। দিপুদির কথায় বলে উঠি, না না অসুবিধার কি আছে। তারপর কোনো ভূমিকা ছাড়াই একটা চেয়ার টেনে এনে আমার পাশে বসতে বসতে বলে, একটু বসলে তোমার আপত্তি নেই তো। না না, বসুন না। চারদিকের বাড়িতে এবং আমাদের বাড়ির দীপাবলির জন্য লাগানো বিভিন্ন আলো হালকাভাবে এসে পড়ছে বারান্দায়। একটা হালকা আলোর রেশ দিপুদির মুখেও। তোমার নিশ্চয়ই খুব জানার ইচ্ছে আমি হঠাৎ করে কেন আলাস্কা গেলাম, হঠাৎ তিমি মাছের উপর রিসার্চ ব্যাপারটাই বা কি, আমাকে চমকে দিয়ে খুব শান্ত গলায় বলে দিপুদি। আমি কিছু বলতে পারি না। চুকচি পেনিনসুলা সাইবেরিয়ার একদম পূর্বে এক ছোট্ট জায়গা। আমাদের পূর্বপুরুষদের বসতি ছিল সেখানে। আমার বাবা খুব ছোটো বয়সে ঠাকুরদার সাথে চেচনিয়ায় চলে যায়। সেখানে তখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে চেচনিয়ানরা। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। কৈশোরেই বাবা সেই রেবেল দলের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর এক যুব সম্প্রদায়। বাবা বিয়ে করে দলেরই এক কমরেডকে। কোটজেবুর নাম শুনেছ। আলাস্কার একদম পশ্চিম প্রান্তের এক ঘুমিয়ে থাকা গ্রাম । আমার মা ছিলেন কোটজেবুর। বাবা আর মা, দুজনের গ্রামের মানুষরা, বিশেষ করে বয়স্ক মানুষরা মনে করতেন, তাদের পূর্বপুরুষরা এসেছেন তিমি মাছের থেকে। তারা তিমি মাছের বংশধর। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, প্রজন্মের পর প্রজন্ম, এই গল্প শুনে এসেছে। আমিও শুনেছি আমার ঠাকুমার মুখে। আমার আর আমার দুই ভাইয়ের জন্ম চেচনিয়ায়। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্যে আমাদের জন্ম। রাশিয়ার দুভ্রোভকা থিয়েটারের যে হোস্টেজ ক্রাইসিস, সেখানে রাশিয়ার আর্মির হাতে আমার বাবা মা দুজনেই মারা যান। ঠাকুরদা ঠাকুমা আমাদের নিয়ে পালিয়ে আসেন চুকচি। পালিয়ে আসার সময় বেরিং স্ট্রেটে আমাদের নৌকো উল্টে গিয়ে আমার দুই ভাই আর ঠাকুরদা চিরতরে হারিয়ে যায়। ঠাকুমার সাথে ভাগ্যক্রমে আমি চুকচি পৌছোই । আমি স্থবিরের মতো বসে শুনতে থাকি। ঠিক শুনছি কিনা বোঝার জন্য নিজেকে চিমটি কাটবো ভাবি। কিন্তু দিপুদির সামনে করা ঠিক হবে না ভেবে, চুপচাপ বসে থাকি। অনেকক্ষণ দিপুদি চুপচাপ বসে থাকে। চারিদিকে শুধু ছাড়াছাড়া বাজির আওয়াজ।

তিমি সম্পর্কে তুমি ঠিক কতটুকু জানো, দিপুদির প্রশ্নে সম্বিত ফেরে। আমি আমতা আমতা করছি দেখে দিপুদি বলে, আমাদের গ্রামের পাশেই আর্কটিক সমুদ্র। প্রায়শই সেখানে তিমি মাছ দেখা যেত। মূলত হাম্পব্যাক

প্রজাতির তিমি। একেকটা তিমির ওজন প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার কেজি, আর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ থেকে ৫০ ফিট। ভাবা যায় কি বিশাল তাদের গঠন। ছোটো ছোটো দলে ঘুরে বেড়ায়, আর্কটিক সমুদ্রের ঠান্ডা জল থেকে খাবার সংগ্রহ করে। কিন্তু ডিম পারার জন্য মাইগ্রেট করে ১৫ থেকে ১৬ হাজার কিলোমিটার। সেই বিষুবরেখা অঞ্চলে গ্রীষ্মের জলে গিয়ে তারা সন্তানের জন্ম দেয়। আশ্চর্য হল কিভাবে তারা এই লম্বা রাস্তা খুঁজে ফিরে যায় তাদের জন্মের জায়গায়। এটা এখনো রহস্য বিজ্ঞানীদের কাছে। হঠাৎ একটা দারুণ শব্দ করে বাজি ফাটে। আমি চমকে উঠি। খেয়াল করি একা বারান্দায় বসে আছি। চারপাশের বাড়িগুলোর দীপাবলির আলোগুলো জ্বলছে নিভছে। রাস্তার বাচ্চাগুলো বাড়ি চলে গেছে। দীপান্বিতা অমাবস্যা নেমে এসেছে শক্তি আরাধনার লগ্নে। কিন্তু দিপুদি নেই তো। এই যে হাম্পব্যাক তিমির কথা বলছিল। তাহলে কি এসব কিছুই বলেনি। সব আমার মনগড়া। কিন্তু দিপুদি তো এসেছিল ইন্টারনেটে কাজ করার জন্য। কখন বেরিয়ে গেল। আমার কেমন যেন পাগল পাগল লাগতে থাকে। চারপাশের দেয়াল যেন এগিয়ে আসছে আমার দিকে। দেয়ালগুলো হালকা শ্যাওলা রঙের। তার মধ্যে যেন বিশালদেহী এক ঝাঁক তিমি সাঁতার কাটছে, আর কিছুক্ষণ পরে পরে বিশাল পাখনা দিয়ে ঝাপটা দিচ্ছে জলের উপরের অংশে। আমার চোখেমুখে তীব্র ঠান্ডা জলের ফোঁটা এসে লাগে।

সেদিন রাত্রে আমার খুব জ্বর আসে। চারিদিকে খুব ডেঙ্গু হচ্ছে। পাড়ার কয়েকজন ডেঙ্গুতে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে। বাড়ির লোক খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। কাল সকালেই টেস্ট করাতে হবে, বারবার বলতে থাকে মা। আর তুমি কাল সকালেই যেখান থেকে পারো পেঁপে পাতা জোগাড় করে নিয়ে আসবে, বাবাকে বলে। আমার মাথায় তখন কিছুই ঢুকছে না। আমি শুধু ভাবছি, ১৫ - ১৬ হাজার কিলোমিটার তিমিগুলো সাঁতার কাটে, শুধু যেখানে জন্মেছে, সেখানে গিয়ে সন্তান প্রসব করবে বলে । কি করে ওই অতল সমুদ্রের মধ্যে দিক ঠিক করে ওরা জন্মস্থানে পৌঁছোয়। কি রহস্য এর মধ্যে। কেন তারা আর্কটিক সমুদ্রেই সন্তানের জন্ম দেয় না। আর ভাবতে থাকি, কবে দিপুদির সাথে দেখা করতে পারব, কবে জানতে পারব দিপুদি কি আমাকে সেদিন ওইসব কথা বলেছিল, নাকি সবই আমার কল্পনা। সারারাত আমার ঘুম এল না। মা পাশে সারা রাত জেগে বসা। বাবা সকালে সঞ্জীবনী সেন্টার থেকে লোক ডেকে আনল, ডেঙ্গু টেস্টের জন্য। কিন্তু আমি কিছুতেই শান্ত থাকতে পারছি না। দিপুদির সঙ্গে দেখা হওয়াটা খুব খুব জরুরি। এদিকে ডেঙ্গু টেস্ট পজিটিভ এসেছে। শরীর খুবই কাহিল। প্লেটলেট অস্বাভাবিক কমে গেছে। মা প্রতিদিন রাত জেগে আমার পাশে বসে থাকে। আমার খালি মনে হয় দেয়ালগুলো আমার দিকে চেপে আসছে। একটা সময় দেয়ালগুলো আর নেই । চারদিকে শ্যাওলা রঙের সমুদ্রের জল, আর বিশাল বিশাল তিমি ঘুরে বেড়াচ্ছে। চোখের পাতা ভারী হয়ে এলেও ঘুম আসে না।

কীসের শব্দে যে তন্দ্রা ভেঙে যায়। দূরে কোনো বাড়িতে সন্ধ্যার শাঁখ বাজছে। মাথাটা প্রচণ্ড ধরে আছে। কোনোরকমে মাথাটা পাশে ফেরাতেই চমকে উঠি, মার পাশে চেয়ারে দিপুদি বসে আছে। আমি অবাক চোখে তাকাতেই বলে ওঠে, কেমন আছো। আমি মাথাটা নাড়ানোর চেষ্টা করি। তুমি একটু বোসো দিপু, আমি ওর পেঁপে পাতার রসটা করে আনি, মা ক্লান্ত পদক্ষেপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। দিপুদি আমার দিকে তাকিয়ে কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে, কপালে হাত রাখে। ধীরে ধীরে হাত বোলাতে থাকে আমার কপালে। ওই হাম্পব্যাক তিমিগুলো বড়ো জোর ৩০ - ৪০ ফুট জলের নিচে ডুবতে পারে। হঠাৎ কোনো প্রেক্ষাপট ছাড়াই দিপুদি তিমির গল্প শুরু করে। ওরা মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ তৈরি করতে থাকে আর জলের মধ্যে আশ্চর্য বুদবুদ তৈরি করে। সেই শিসের আওয়াজ আর বুদবুদের টানে ছোটো বড়ো মাছগুলো ওই দলের মাঝখানে এসে পড়ে। একটা অমোঘ টান, জাটিঙ্গার পাখিগুলো যেমন আগুনে ঝাঁপ দেয়, ছোটো মাছগুলো যেন সেইভাবে ওই শীতল ধারালো দাঁতের দিকে ঝাঁপ দেয়। ঘন শ্যাওলা জলের মধ্যে টকটকে রক্তের দানা এদিক ওদিক ছড়িয়ে যায়। আর তিমির

দলের মধ্যে তখন এক প্রাগৈতিহাসিক উল্লাস, বিশাল পাখনার ঝাপটায় নিস্তরঙ্গ জলের উপর ক্রমাগত উল্লাসের ফেনা তৈরি করতে থাকে। হিমশীতল চরাচরে এক আদিম শক্তির রঙ্গমঞ্চ, আর আকাশে নর্দার্ন লাইটের রোমাঞ্চকর খেলা। এইই পৃথিবীর সূচনা লগ্ন। আমার কেমন শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। মুখটা কখন দুটো শ্যাওলা রঙের বুকের মধ্যে বাঁধা পড়ে গেছে, দেখতে পাই দুটো বিশাল পাখনা আমাকে জড়িয়ে ধরছে। এক সম্মিলিত তীব্র শিসের আওয়াজ আমার কানের পর্দা ফাটিয়ে দিচ্ছে। চোখের সামনে গাঢ় নীল রঙের বুদবুদ ভেসে উঠছে। সারা গায়ে বরফের কুচি এসে বিঁধছে ক্রমাগত। আমি ডুবে যাচ্ছি এক অতল জলে। অনেক কষ্টে ঘন কালচে শ্যাওলা রঙের বুক থেকে মুখ তুলে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করি, একশ্বাসে বলে ফেলি, তোমরা তিমি মাছ মারতে দিপুদি বলেই আবার জলের মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকি। অনেকদূর থেকে যেন দিপুদির গলা ভেসে আসে, আমাদের মতো উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়েদের অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। সরকারি সামরিক জঙ্গীরা আমাকে কতবার ছিন্নভিন্ন করেছে। যৌনাঙ্গ কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে। রক্তাক্ত শরীর নিয়ে হেঁটেছি হাজার মাইল, ঠাকুমা গায়ের কাপড় ছিঁড়ে যৌনাঙ্গে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে, কিন্তু রক্ত বন্ধ হয়নি। আমরা দেশে ফেরার জন্য, গ্রামে ফেরার জন্য, শুধু হেঁটে গেছি, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। চোখের সামনে শীতল সাদা বিশালাকায় দাঁত দেখতে পাই। দাঁতগুলো কামড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে থাই এর মাংস।

বুক ভরে একবার শ্বাস নিতে চাই আমি। কিন্তু বিশাল পাখনার নীচে আমার পাঁজরগুলো যেন দুমড়ে যাচ্ছে। শেষবারের মত প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে শ্যাওলা ঘন জলের উপর মাথা তুলি। চোখের সামনে কালো নুড়ির এক বিষণ্ন সমুদ্রতট, দুর থেকে ধীর পায়ে এক মহিলা সমুদ্রের দিকে হেঁটে আসছে। আমি হাত তুলে আপ্রাণ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আরেকটু কাছে এলে আমি বজ্রাহত, এতো দিপুদি। আমার শিয়র থেকে একটা বিশালাকায় তিমি ঝাঁপ দিয়ে জলের উপর ওঠে। নিজের চোখকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। তিমিটা এক সুদর্শন লম্বা কেশযুক্ত সুঠাম পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ধীরে ধীরে কালো নুড়ির সৈকতে উঠে দিপুদিকে আলিঙ্গন করে। তারপর রমণে লিপ্ত হয়। হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান আমার হাতে, দিপুদি আমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে সাঁতার কাটতে শুরু করে। কোথায় যাচ্ছি দিপুদি। আমাদের ১৫ - ১৬ হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিতে হবে, দিপুদি খুব শান্ত স্বরে বলে। গ্রীষ্মের জলে গিয়ে আমি প্রসব করব। আমার সমস্ত জনজাতি সেখানে জন্ম নেবে। আমরা তিমির সন্তান। তিমি মাছ আমরা মারতে পারি না । মারলে আমাদের আর সন্তান হবে না। সমস্ত পৃথিবী আমাদের গলা টিপে মারতে চায়। প্রান্তিক মানুষদের পৃথিবীকে মেরে ফেলতে চায়। কিন্তু, আমি কিছুতেই তা হতে দেব না। আমি আলাস্কা গিয়েছিলাম জীবনের শেষ রমণের জন্য। দেখো, আমার পেটে হাত রাখো, গর্ভে আমার শয়ে শয়ে সন্তান। দেখো, ঠিক বুঝতে পারবে। দিপুদি আমার হাতটা টেনে নিজের পেটের উপর রাখে। উপলব্ধি করি, সেখানে ভরা কোটালের ঢেউ। ঝাপট মারছে রাশি রাশি ভ্রূণ। শিহরিত হয়ে উঠি। এতো প্রাণ, এতো প্রাণের স্পর্শ আমি আগে কোনোদিন পাইনি। দিপুদি আরো গভীরে ডুব দেয় আমাকে নিয়ে, দুটি বিশাল পাখনা মেলে গ্রীষ্মের দেশের দিকে সাঁতার দিতে থাকে। এখন শুধু কালো শীতল জল আমার চারদিকে।

ডেঙ্গুর জ্বর বাড়লে কি ঘাম হয়। আমার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে, বুঝতে পারি । একটা অচেনা অস্বস্তি নিয়ে বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে থাকি। চোখের সামনে শ্যাওলা বর্ণ জলের ঢেউ, ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। তার সঙ্গে ক্রমাগত যুঝে চলেছে দু'তিনটি ডিঙি নৌকা। শীতের জামাকাপড়ে আগাগোড়া মোড়া কিছু মানুষ হারপুন নিয়ে একটা তিমি মাছকে ধাওয়া করে চলেছে। তিমিটিকে গেঁথে নিতে চাইছে হারপুনের ধারালো ফলায়। বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। তিমিটি আপ্রাণ সাঁতরে বাঁচতে চাইছে, পিঠের রন্ধ্র থেকে ছিটিয়ে দিচ্ছে হিমশীতল জলের ফোয়ারা। তীব্র শ্যাওলা- নীল ঠান্ডায় সেই ফোয়ারায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে বাঁচার আর্তি। আমি সেই বাঁচার আর্তি অনুভব করি সমস্ত

ইন্দ্রিয় দিয়ে। অবশেষে। এক নিপুণ হারপুনের ফলা তিমিটিকে গেঁথে ফেলে। সাদা চকচকে ধারালো দাঁত সহ জোয়ালটা ঘোলাটে আকাশের দিকে উঠে আসতেই, আমি স্থবির হয়ে যাই, একী, এতো দিপুদি। পাখনার বাঁধন আলগা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আমি দিপুদির বুক থেকে উন্মুক্ত হয়ে গভীর ঠান্ডা জলে তলিয়ে যেতে থাকি। আমার চারদিকে শুধু পিচ্ছিল, অনন্ত জলরাশি। তিমিটিকে বেঁধে নিয়ে ওই সামুদ্রিক মানুষেরা তটে ফিরে যায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে সুচারুভাবে তার দেহ মাংস মজ্জা কেটে নিতে থাকে। সবার অলক্ষে রাশিরাশি ভ্রূণ কালো নুড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে যেতে থাকে।

বেশ কিছুদিন অসুস্থতার পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠি। মায়ের নিয়মিত করে দেওয়া পেঁপেপাতার রস, আমাকে হাসপাতাল যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছে, এযাত্রা। অফিসের বহু কাজ জমা হয়ে রয়েছে । অগত্যা আমি প্রচণ্ড ব্যস্ত হয়ে পড়ি টানা কাজকর্মের মধ্যে। অবশেষে কয়েকদিন পর কাজের চাপ হালকা হলে, এক রবিবার সকালে হঠাৎই দিপুদির কথা মনে পড়ে। সময় নষ্ট না করে আমি ছুটে যাই দিপুদির বাড়ি। ভগ্নপ্রায় বাড়িটির সামনে দাড়িয়ে বেশ কয়েকবার ডাকাডাকির পরও দিপুদির কোনো সাড়া পাই না। গলিটা ঘুরে সুভাষদার চায়ের দোকানে আসি। সুভাষদা, দিপুদিকে দেখেছ এর মধ্যে। কে দিপুদি। আরে ওই যে সান্যাল বাড়ির পাশের একতলা প্রায় ভেঙে পড়া বাড়িটায় থাকে, ওয়ার্ড অফিসে কাজ করে। আরে ওই যে মে মাসে আলাস্কা গেল। সুভাষদা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। শোন ডেঙ্গু থেকে উঠেছিস, শরীর ক্লান্ত, বস চা দিচ্ছি । শরীর খুব কাহিল হলে এরকম নানা দিপুদি, দিপুদার কথা মনের মধ্যে আসে। বোস বোস, চা দিচ্ছি লিকার চিনি ছাড়া, ভালো লাগবে। আমার মাথাটা শূন্য লাগে, ভরহীন, অবাক হয়ে যাই, কি বলছে সুভাষদা। এই তো শেষ দিনও আমাদের বাড়িতে আমার খাটের পাশে বসে কপালে হাত বুলিয়ে এলো। নাকি পাখনা। আমি স্বগতোক্তির মতো বলতে থাকি, সুভাষদা তুমি লিলিয়ান অ্যালিংকে দেখেছো, তুমি লিলিয়ান অ্যালিংকে চেনো।

নির্মাণ প্রসঙ্গে-

অনেকটা সলিসকি, ঘোরের মধ্যে কথা বলার ঢঙে লেখা এই পাঠবস্তু। কথোপকথন সেও আসলে একই ব্যক্তির মস্তিষ্কের কোষ থেকে নির্গত শব্দমালা। সেকারণে দাঁড়ি এবং কমা ছাড়া (ন্যুনতম যতিচিহ্ন) অন্য কোনোরকম যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি। শব্দের যা দ্যোতনা তা পাঠকভেদে ভিন্ন ভিন্ন ঘটবে তেমনটাই উদ্দেশ্য। পাঠক বা শ্রোতাকে কেবল একটি ঘটনাক্রমের ইশারা দেওয়া হয়েছে মাত্র। এটিও ফিল্মের একটি প্রত্যুত্তরী পাঠবস্তু হিসেবেই লিখিত হয়েছে।

অর্ণব চক্রবর্তীর জন্ম কলকাতা ১৯৭৩। শিক্ষা পদার্থবিদ্যায় স্নাতোকত্তর। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত। লেখালেখি অনিয়মিত, মূলত গদ্য। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সঙ্গে ছাত্রাবস্থায় যুক্ত থেকেছেন। পেশার পাশাপাশি ভ্রমণ অন্যতম আগ্রহের বিষয়। মূলত হিমালয় ও পুরুলিয়ার পাহাড়কে কেন্দ্র করে ঘোরা জীবনের অন্যতম প্রিয় কাজ বলে মনে করেন।